প্রবাদের চিহ্নতত্ত্ব : প্রসঙ্গ 'বৃষ্টির প্রবাদ'

মনিরা বেগম*

সারসংক্ষেপ: মুহম্মদ আবদুল হাই-এর 'বৃষ্টির প্রবাদ' প্রবন্ধে বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রয়াস লক্ষ করা যায়, যাতে তিনি বাঙালির গ্রামীণ কৃষি-সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত বৃষ্টি-বিষয়ক প্রবাদগুলো তুলে ধরেছেন। এ প্রবাদসমূহ সূচক ও প্রতীক চিহ্নের আশ্রয়ে মানব জীবনের কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিকে সম্ভাব্য ফলাফল অনুমানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। প্রবাদ চিহ্নসমূহের অর্থ বক্তা ও শ্রোতা উভয় পক্ষের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। মূলত দ্যোতিত সংহিতাগুলোই ভাষিক যোগাযোগে মূল ভূমিকা পালন করে। আলোচ্য প্রবন্ধে বৃষ্টি-বিষয়ক বাংলা প্রবাদসমূহ কীভাবে চিহ্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসেবে দ্যোতিতের বাচ্যার্থের সঙ্গে একাধিক গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে; এবং প্রবাদের পাঠকৃতিতে পদকাঠামোর দ্যোতকরূপে বিভিন্ন প্রতীকী, সূচকীয়, মিথিক চিহ্ন ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করে বাঙালি সমাজ-সংস্কৃতিতে বাগর্থগত দ্যোতনা সৃষ্টি করে তা বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবাদের চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ অধ্যয়নের বিষয়টি বহুদিন ধরে চলে আসছে। প্রথমদিকে এ গবেষণার সূত্রপাত করেন রুশ লোকসাহিত্যবিদ ও চিহ্নবিজ্ঞানী পোর্ট জি বোগাতিরেভ (Bogatyrëv)। তিনিই প্রথম ১৯৩০ সালে সাহিত্য বিশ্লেষণে প্রবাদের চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করেন (Bøgatyrëv, 1971: 366)। পরবর্তীকালে প্রবাদ গবেষণা ক্রমশ একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যয়ন হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। লোক সাহিত্যের প্রকৃতিতে পার্থক্য থাকলেও একটা ঐক্যসূত্র বিভিন্ন দেশের লোকসাহিত্যকে এক শ্রেণিভুক্ত করেছে। জীবন্ত সমাজের প্রত্যেকটি স্তরে যে মানস প্রতিফলনের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, তার মধ্যে আপন সত্তা রক্ষা করতে পেরে লোকসাহিত্য সংস্কৃতির মুখবন্ধ হিসেবে সে সমাজের পরিচয় বহন করে চলে (কাজী দীন, ১৯৬৮)। লোকসাহিত্যের একটি প্রধান গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো প্রবাদ, যা সংস্কৃতির মননশীল সৃষ্টি এবং যার সজীবতা মৌখিক ধারার মধ্য দিয়ে রক্ষিত হয়।

প্রবাদ

প্রবাদ হলো কোনো জাতির সুদীর্ঘ ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত রসাভিব্যক্তি। প্রবাদে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক সত্যোপলব্ধি পাওয়া যায়। মানব সভ্যতার উন্মেষের সময় থেকেই মৌখিক প্রবাদের উৎপত্তি হয়েছে বলে

* সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

https://doi.org/10.62328/sp.v57i3.6

অনুমান করা হয়। কোনো কোনো প্রবাদ রচনার মূলে ব্যক্তি বিশেষের নাম আরোপ করা হয়। পাশ্চাত্যে লোক-সাহিত্যে, যেমন — সোলোমন, সক্রেটিস, প্লেটো প্রমুখের নামে বহু প্রবাদ আছে, বাঙালি সমাজেও ডাক ও খনার বচন নামে বহু প্রবাদ প্রচলিত আছে (আশুতোষ, ১৯৬২)। এসব ডাক ও খনার বচন ছিল বাঙালি কৃষিজীবী মানুষের অমূল্য সম্পদ। সাধারণ কৃষিনির্ভর মানুষের অভিজ্ঞতার অন্তঃসার এসব প্রবাদ-প্রবচনে ধরা পড়েছে। মূলত শস্য পরিচর্যা, পানির ব্যবহার প্রভৃতি জটিল প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এসব প্রবাদে একটি নির্দেশনা পাওয়া যায়, যা বাঙালি কৃষকের অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করে। কৃষির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হলেও এসব প্রবাদের গুরুত্ব কমে যায়নি, বরং গ্রামীণ মানুষ এসব প্রবাদের ব্যবহারিক দিককে এখনো মেনে চলেন (সৈয়দ আলী, ১৩৯২)। ভাষার সংগঠন অনুযায়ী প্রবাদকে গদ্যাশ্রয়ী প্রবাদ ও পদ্যাশ্রয়ী প্রবাদ এ দুই ভাগে ভাগ করা যায়। গদ্যাশ্রয়ী প্রবাদে সাধারণত কোনো উপদেশ নীতিকথা, বা চিরায়ত সত্য প্রকাশে ব্যবহার করা হয়, যেমন — অনেক গর্জনে ফোঁটা বৃষ্টি। ভাষা প্রকাশই এর মূল লক্ষ্য, রস সৃষ্টির দাবি এখানে গৌণ থাকে। অন্যদিকে পদ্যাশ্রয়ী প্রবাদে অন্ত্য-মিলের কারণে পাঠক-শ্রোতা অধিক পছন্দ করে। মূলত এখানে উপদেশমূলক বাণী প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাদের মধ্য দিয়ে ছন্দের বিষয়টিও লক্ষণীয়। মূলত পরিমিত অবয়বের মধ্যেও অনেক সময় পরিণত রচনাশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন,

ক. অল্প বৃষ্টিতে কাদা হয়, অনেক বৃষ্টিতে সাদা হয়।
খ. অল্প শোকে কাতর, অনেক শোকে পাথর।

মূলত ভাব প্রকাশের সাথে সাথে রস সৃষ্টিও পদ্যাশ্রয়ী প্রবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ভাষার প্রয়োগিক স্তরে একটি প্রবাদ যে দ্যোতনা সঞ্চার করে তার দ্যোতিত হিসেবে সক্রিয় থাকে প্রবাদটির বাগর্থ। মূলত প্রবাদ প্রয়োগের মাধ্যমে এর ব্যবহারকারী বোঝাতে চায় এর দ্যোতিত (signified) রূপটিকে। প্রবাদের পদকাঠামো কখনো আলংকারিক ভাষায়, কখনো রূপক বা প্রতীকের বর্ণিলতায়, কখনো বা মিথিক সূত্রসন্ধানে যা উপস্থাপন করে তার প্রধান অভীষ্ট হলো, বিশেষ কোনো দ্যোতিত তাৎপর্য প্রদান করা (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০১১)। মূলত এসব প্রবাদে প্রতীক চিহ্নের আশ্রয়ে মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ কিছু বিষয়, যেমন — প্রকৃতি, নারী, চারিত্রনীতি ইত্যাদিকে ঘিরে সৃষ্টি হয়। প্রকৃতি বিষয়ক প্রবাদগুলোর মধ্যে প্রকৃতির বহিরঙ্গ রূপের কোনো রস পাওয়া যায় না, বরং প্রকৃতির যে একটি ব্যবহারিক দিক আছে, তার পরিচয় প্রকাশ পায়। ধাঁধার প্রকৃতির সাথে প্রবাদের প্রকৃতির এখানেই পার্থক্য। এদিক থেকে বিচার করলে ধাঁধা কবিতা আর প্রবাদ হলো দর্শন (আশুতোষ, ১৯৬২)।

প্রবাদের চিহ্নতত্ত্ব

চিহ্নকাঠামোতে একটি চিহ্ন বলতে দ্যোতক (signifier) ও দ্যোতিত (signified) বিষয়ের মধ্যে একটি বাইনারি (binary) সম্পর্ককে বোঝায়। এ কাঠামোতে একটি

চিহ্ন প্রদত্ত চিহ্নপদ্ধতির প্রাথমিক উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়, যার অর্থ সেই ব্যবস্থার অন্য চিহ্নগুলোর বৈপরীত্যের সম্পর্কের ভিত্তিতে তা সম্পর্কিত থাকে। একটি বাচ্যার্থসংবলিত চিহ্ন ও গূঢ়ার্থসংবলিত চিহ্নের বাগর্থিক পার্থক্য সূচিত বিষয় একই সাথে সম্ভাব্যতা থাকা সত্ত্বেও কোনো নির্দিষ্ট সংস্কৃতির মধ্যে আন্ত-বিষয়গত সম্মতিতে অর্থ বর্ণনা করার সুযোগকে ছাড়িয়ে না দিয়ে কাঠামোগত বিধিনিষেধ থেকে মুক্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে প্যারেমিওলজিস্টগণ (Paremiologists) প্রবাদের চিহ্নের বাগর্থিক বর্ণনা প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেন — (ক) প্রবাদচিহ্নের অর্থগুলোর অন্তর্দৃষ্টি ও (খ) প্রবাদের মেটা-ভাষাগত বিবরণ (Grzybek, 2014:93)। সাধারণত প্রবাদের চিহ্নকে গূঢ়ার্থ সংবলিত চিহ্ন (Connotative Super-Sign) হিসেবে অভিহিত করা নিয়ে পক্ষে বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। প্রবাদের চিহ্নের অর্থবিষয়ক এ ধারণাটি প্রথম দেন গ্রিমাস (Greimas, 1970:310)। গ্রিমাসের বক্তব্যের আলোকে পরবর্তীকালে কানাডিয়ান নৃবিজ্ঞানী ক্রিপো বলেন (Crépeau, 1975: 288): 'On the first level, signification is determined by denotation, i.e., by an immediate (albeit arbitrary) relation between designating and designated. On the second level, signification is determined by connotation, i.e., by a mediated relation between connotating and connotated'. অর্থাৎ চিহ্নায়নের প্রথম স্তরে বাচ্যার্থের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় স্তরে গূঢ়ার্থের মাধ্যমে চিহ্নায়িত হয়। ক্রিপোর পূর্বে রুশ পণ্ডিত এরকাস্কিজ (Čerkasskij) ও চিহ্নের গূঢ়ার্থ বিষয়ের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করেছেন। তাঁর মতে, চিহ্নের প্রকাশ ও ধারণার পর ভাষাগত স্তরে চিহ্নের উপলব্ধির একই সাথে অদৃশ্য পাঠের ভাষাতাত্ত্বিক স্তরের জন্য প্রকাশ প্রতিনিধিত্ব করে। যেখানে একাধিক চিহ্নপদ্ধতি একইভাবে পরিচালিত হয় (as cited in Grzybek, 2014:93-4)। এরকাস্কিজ ও ক্রিপোর প্রবাদের বাচ্যার্থ ও গূঢ়ার্থবিষয়ক ধারণাটি নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়:

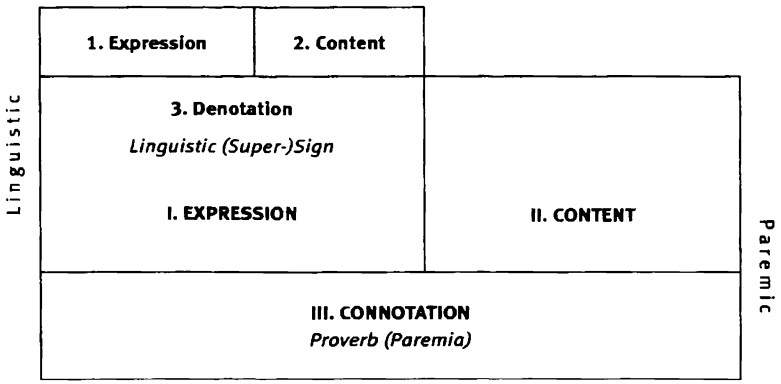

চিত্র: এরকাস্কিজ ও ক্রিপোর অনুসারে প্রবাদের গূঢ়ার্থবিষয়ক ধারণা উপস্থাপন (Grzybek, 2014:94)

প্রবাদের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ব্যাখ্যা দিলেও ক্রিপো ও এরকাস্কিজ মূলত অভিন্ন ধারণা প্রদান করেছেন। এ প্রসঙ্গে এরকাস্কিজ "The apple does not fall far from the tree" — জটিল চিহ্নটি একটি নির্দিষ্ট স্বতন্ত্র পরিস্থিতি বোঝাতে ব্যবহার করেন। এ থেকে বলা যেতে পারে, এ পাঠকৃতি প্রবাদ হিসেবে কোনো পৃথক পরিস্থিতি নয় বরং এক শ্রেণির পরিস্থিতি হিসেবে চিহ্নিত একটি চিহ্ন হিসেবে কাজ করে। এক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক দুটো চিহ্নায়ন পদ্ধতি কাজ করে। মূলত এর এরকাস্কিজ মডেলভিত্তিক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, অন্যদিকে ক্রিপো উপমা ও সাদৃশ্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে বিশ্লেষণের পথে অগ্রসর হন।

পণ্ডিত রলাঁ বার্ত সোস্যুরের চিহ্ন-বিষয়ক তত্ত্বের আলোকে পাঠকৃতিতে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রপঞ্চের চিহ্নতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। তাঁর এ চিহ্নতাত্ত্বিক কাঠামোর মধ্যে অর্থের পারস্পরিক ক্রিয়ার ধারণার উপর একটি সুসংগঠিত মডেল উপস্থাপন করেন, যা চিহ্নায়নের দ্বি-ক্রম (Two orders of Signification) নামে পরিচিত। রলাঁ বার্তের চিহ্নায়ন-তত্ত্বটি নিম্নোক্ত মডেলের সাহায্যে উপস্থাপন করা যায়:

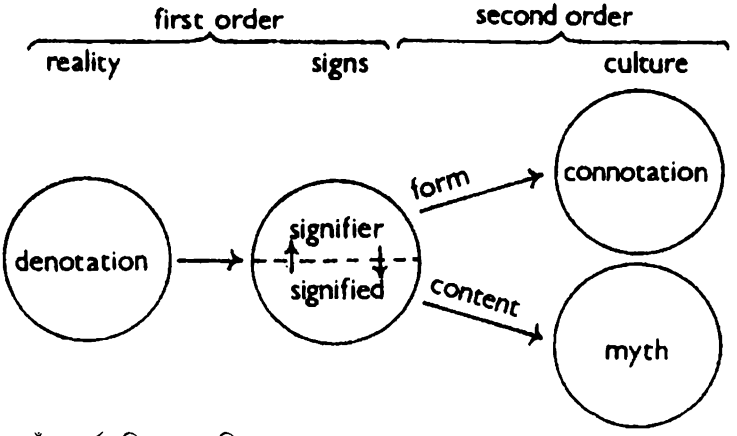

চিত্র: রলাঁ বার্তের চিহ্নায়নের দ্বি-ক্রম (Fiske, 1990:88)

উপস্থাপিত চিত্রে দেখা যায়, রলাঁ বার্ত সামাজিক জীবনের সাথে চিহ্ন কীভাবে সম্পর্কিত তা তুলে ধরেছেন। তিনি চিহ্নায়ন প্রথম ক্রমকে প্রাথমিক অর্থ (denotation) এবং এ প্রাথমিক অর্থের চিহ্ন দ্যোতকের দ্বিতীয় ক্রম হলো গূঢ়ার্থ (connotation) আর ভাষা দ্যোতিতের (signified) দ্বিতীয় ক্রম হলো মিথ (myth)। একটি ভাষিক গোষ্ঠীতে কোনো ভাষা সংগঠন যথা — শব্দ বা বিভিন্ন বাক্যগত উপাদানের অর্থবোধের প্রক্রিয়াটি প্রাথমিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া (first-order of signification) হিসেবেই ব্যাখ্যাযোগ্য। এ প্রাথমিক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়াটি যখন

কোনো নতুন ব্যঞ্জনায় তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে দ্বৈতীয়িক চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া (second-order of signification) তৈরি করে, তখন তা মিথের চিহ্নায়ন কাঠামোরূপে উন্নীত হয়। মূলত ভাষা দ্যোতকের সাথে ব্যক্তির নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা ভাবনা যুক্ত হলে, তা গূঢ়ার্থ আর ভাষা দ্যোতিতের সাথে সামাজিক চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ, ঐতিহ্য প্রভৃতি যুক্ত হয়ে মিথ তৈরি হয় (Barthes, 1972)।

এদিক থেকে আমরা প্রবাদকে চিহ্নায়নের দ্বিতীয় ক্রমের মিথের সাথে সংযোগ করতে পারি। যা মূলত একটি ভাষা-সমাজের বিভিন্ন ভাষাচিহ্নের আরোপিত অর্থবোধের সাহায্যে নির্মিত হয়। চিহ্নায়ন প্রথম ক্রম প্রাথমিক সজ্জার পদ কাঠামো প্রবাদে সরাসরি মূল বক্তব্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়। যেমন:

- সময় বহিয়া যায়, নদীর স্রোতের প্রায়।
- ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
- অর্থই অনর্থের মূল।

ওপরের উদাহরণ লক্ষ করলে দেখা যায়, উদাহরণগুলোতে প্রবাদগুলোকে কোনো প্রকার রূপক বা প্রতীকের আড়ালে না রেখে সরল উপমায় সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে। তবে প্রবাদের পাঠকৃতির দ্বৈতীয়িক সজ্জার পদকাঠামোতে দেখা যায়, প্রতীকায়িত দ্যোতকগুচ্ছ বিশেষ গূঢ়ার্থ প্রকাশ করে। যেমন:

- এক মাঘে শীত যায় না।
- দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো।

এছাড়া আরও এক ধরনের পদকাঠামো প্রবাদের সংগঠন লক্ষ করা যায়, যা ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদকাঠামোর সাহায্যে গঠিত হয়। এ শ্রেণির প্রবাদে মিথিক চিহ্নের সাহায্যে সমাজ-সংস্কৃতির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুনভাবে অর্থায়িত করে ভাষিক চিহ্নের অর্থের সম্প্রসারণ ঘটায়। প্রসঙ্গত নিচের উদাহরণগুলো দ্রষ্টব্য:

- ঘরের শত্রু বিভীষণ।
- যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাবণ।
- বিধি হলে বাম কি করবে রাম।
- নিদানকালে হরি নাম।

উপরিউক্ত উদাহরণগুলোতে বিভিন্ন মিথিক ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গকে দ্যোতকরূপে ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রবাদে পদকাঠামোতে আরও দুটো বিন্যাস স্তর তৈরি করে নেয়। এখানে মিথিক চিহ্নে বিভীষণ, লঙ্কা, রাবণ, রাম, হরি প্রভৃতি দ্যোতক প্রাথমিক দ্বৈতীয়িক সজ্জার দ্যোতকের মতো কেবল প্রতীক নয়, এরা একই সঙ্গে সমাজের ঐতিহাসিক মিথিক অনুষঙ্গরূপে গূঢ়ার্থ প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়,

- অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।

এখানে 'সন্ন্যাসী' চিহ্নটি পরিবর্তন করে বাবা/ওঝা/হুজুর অর্থাৎ অন্য প্যারাডাইম উপাদান নিলে প্রবাদের চিহ্নায়ন প্রক্রিয়া (semiosis) পরিবর্তিত হয়ে যায়। অনুরূপ 'আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ' প্রবাদের ক্ষেত্রে 'আঙ্গুল' এর পরিবর্তে মুখ/নাক/হাত/পা— এ ধরনের অন্য কোনো প্যারাডাইম উপাদান নিলে তা মূল বাগর্থতাত্ত্বিক দ্যোতনা সঞ্চার করতে সক্ষম হয় না। একইভাবে 'ধান ভানতে শিবের গীত' প্রবাদে গীতের পরিবর্তে গান ব্যবহার করা হলে তা আর মূল প্রবাদের পদকাঠামোর সাথে অভিন্ন বাগর্থ বহন করা সত্ত্বেও মূলত সর্বজন গৃহীত হয় না বিধায় তা প্রবাদের মর্যাদা পায় না। এ থেকে বোঝা যায়, সুনির্দিষ্ট পদকাঠামোতে একটি প্রবাদ কোনো ভাষিকগোষ্ঠীতে গৃহীত হলে, তাকে পরিমার্জন বা পরিবর্তন করার সুযোগ প্রায় নেই বললেই চলে অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট পদকাঠামোতেই যে অর্থ প্রকাশে প্রবাদটি সক্ষম হয়, সেই পদকাঠামোর বস্তু পরিপ্রেক্ষিতেই প্রবাদটি সত্য এবং সর্বজনগৃহীত হিসেবে মর্যাদা পায় (সৈয়দ শাহরিয়ার, ২০১১)। তবে এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে নিম্নোক্ত প্রবাদটি উল্লেখ করা যায় —

- রাখে হরি মারে কে।

উল্লিখিত প্রবাদটি বাঙালি সমাজে দীর্ঘদিন প্রচলিত থাকলেও পরবর্তীকালে এ প্রবাদের 'হরি'-এর অন্য প্যারাডাইম উপাদান 'আল্লাহ' সংযুক্ত হয়ে প্রবাদের চিহ্নদ্যোতকের পরিবর্তিত চিহ্নরূপ — 'রাখে আল্লাহ মারে কে' এবং পদকাঠামোগত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও সমাজের মানুষের মধ্যে একটি সাম্প্রদায়িক দূরত্বের কারণে তা সমাজে লোকমুখে গ্রহণযোগ্যতার মাধ্যমে প্রবাদের চিহ্নরূপ হিসেবে গৃহীত হয়ে যায়। অনড় কাঠামোর প্রবাদের চিহ্ন উপাদান পরিবর্তিত হয়ে একটি ব্যতিক্রম উদাহরণ হিসেবে এ প্রবাদটির পদকাঠামো তৈরি হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রবাদ চিহ্নকে সমন্বিত করে সমাজ ও সংস্কৃতি।

গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধের গবেষণা উদ্দেশ্য হলো, মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'বৃষ্টির প্রবাদ' প্রবন্ধের চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা। এক্ষেত্রে গুণাত্মক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে 'বৃষ্টির প্রবাদ' প্রবন্ধের বৃষ্টি-বিষয়ক ১৪টি প্রবাদকে নির্বাচন করা হয়েছে এবং দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে প্রবাদ-সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপন

মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের 'বৃষ্টির প্রবাদ' প্রবন্ধের নিম্নলিখিত প্রবাদগুলোকে উপাত্ত হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে (মুহম্মদ আবদুল, ১৩৯৫):

১ জ্যৈষ্ঠে শুখা আষাঢ়ে ধারা,
শস্যের ভার সয়না ধরা।
জ্যৈষ্ঠে খরে আষাঢ়ে ঝরে,
কেটে মেড়ে গোলাভরে।

২ মরণ, ধরণ, পানি,
বরাহ বলে তিন নাহি জানি॥

৩ পূর্ব আষাঢ়ে দখিণা বায়,
সেই বৎসর বন্যা হয়।

৪ বামুন, বাদল, বান,
দক্ষিণা পেলেই যান।

৫ প্রথম বছরে ঈশানে বায়,
হবেই বর্ষা কয় খনায়॥

৬ শ্রাবণে বয় পূবে বায়। হাল ছেড়ে চাষা বাণিজ্যে যায়॥
ভাদ্র আশ্বিন বহে ঈশান। কাঁধে কোদাল নাচে কৃষাণ॥
বৎসরের প্রথম ঈশানে বয়। সেই বৎসর বর্ষা হয়॥
ছাদুরে মেঘে পূবে বায়। সেদিন বৃষ্টি কে ঘোচায়॥

৭ চৈতে কুয়া ভাদরে বান। নরের মুণ্ড গড়াগড়ি যান॥

৮ আষাঢ়ে নবমী শুকল পাখা। কি কর শ্বশুর লেখা-জোখা।
যদি বর্ষে মুষলধারে, মাঝ সমুদ্রে বগা চরে।
যদি বর্ষে ছিটে ফোঁটা, পর্বতে হয় মীনের ঘটা।
যদি বর্ষে ঝিমিঝিমি, শস্যের ভার না সহে মেদিনী।
হেসে নাকি বসেন পাঠে, চাষার গরু বিকায় হাটে।

৯ পৌষ গরমি বোশেখ জোড়া। প্রথম আষাঢ়ে ভরে গাড়া।
খনা বলে শুনহে স্বামী। শ্রাবণ ভাদরে হবে না পানি॥

১০ যদি বর্ষে আগণে। রাজা যায় মাগনে॥
যদি বর্ষে পোষে। কড়ি হয় তুষে॥
যদি বর্ষে মাঘের শেষ। ধন্য রাজা পুণ্য দেশ॥
যদি বর্ষে ফাগুনে। চিনা কাউন দ্বিগুণে॥
চৈতে বৃষ্টি নাশে রিষ্টি। চাষার ক্ষেতে শুভদৃষ্টি॥

১১ চৈতে থর থর। বৈশাখে ঝড় পাথর॥
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে। তবে জানবে বর্ষা বটে॥

১২ দিনে জল রাতে তারা। এই দেখবে শুকোয় ধরা।
দিনে রোদ রাতে জল। তাতে বাড়ে ধানের বল।

১৩ চাঁদের সভা মধ্যে তারা
বর্ষে পানি মুষল ধারা।

১৪ বেঙ ডাকে ঘন ঘন
শীঘ্র বৃষ্টি হবে জেনো।

'বৃষ্টির প্রবাদ' বিশ্লেষণ

এক

আলোচ্য বৃষ্টি-বিষয়ক কিছু প্রবাদের ক্ষেত্রে, রলাঁ বার্তের চিহ্নায়ন মডেলের প্রথম ক্রম প্রাথমিক সজ্জার পদকাঠামো লক্ষ করা যায়, যার সাহায্যে সরাসরি মূল বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় — ১, ৩, ৯, ১২ ও ১৪ সংখ্যক প্রবাদের মূল বক্তব্য সরাসরি প্রাথমিক সজ্জার পদকাঠামোতে তুলে ধরা হয়েছে। ক্রিপো (Crépeau, 1975)-র মতে, প্রবাদের চিহ্নায়নে উপমা ও সাদৃশ্যের বিষয়টির সাথে ব্যাখ্যা করা যায়। আলোচ্য বৃষ্টি-বিষয়ক প্রবাদে প্রাথমিক সজ্জার পদকাঠামো হলেও তাতে বিভিন্ন উপমা ও সাদৃশ্যের ব্যবহার লক্ষ দেখা যায়। যেমন — এখানে ২, ৪, ৬, ৮ ও ১০ সংখ্যক প্রবাদে বিভিন্ন উপমা ও সাদৃশ্যের ভিত্তিতে পাঠকৃতির চিহ্নদ্যোতকসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। প্রবাদ ২-এ বৃষ্টির সাথে মানুষের মৃত্যু ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তুলনা করা হয়েছে। অনুরূপ প্রবাদ ৩-এ দক্ষিণা বাতাসের সাথে বন্যার সাদৃশ্যের কথা বলা হয়। একইভাবে প্রবাদ ৮-এর পাঠকৃতিতে দেখা যায়, অনাবৃষ্টির অবস্থা বোঝাতে মধ্য সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়ার সাথে তুলনা করা হয় এবং সে স্থানে বক চড়ে বেড়ানোর কথা বলা হয় এবং অতিবৃষ্টি বোঝাতে পর্বতের ওপর মাছের ঘুরে বেড়ানোর বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। আবার প্রবাদ ১০-এর পাঠকৃতিতে দুর্ভিক্ষের চরম অবস্থা বোঝাতে রাজার ভিক্ষে করার বিষয়টি উপমা হিসেবে আনা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের উপাত্ত হিসেবে গৃহীত প্রবাদসমূহের ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রকৃতি বিষয়ক মানুষের অভিজ্ঞতাভিত্তিক অনুমান কোনো প্রকার রূপক বা প্রতীকের আড়ালে না রেখে সরাসরি উপস্থাপন করা হয়েছে। সাধারণত প্রবাদ প্রতীকায়িত দ্যোতকের মাধ্যমে বিশেষ গূঢ়ার্থকে ধারণ করে থাকে। আলোচ্য প্রবাদসমূহ বাচ্যার্থের সীমায় সরাসরি উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ প্রবাদ ১, ৩, ৫, ৬, ৯, ১১, ১২, ১৩ ও ১৪-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এগুলোতে কোনো প্রকার রূপক বা প্রতীকের আড়ালে না রেখে বক্তব্য সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে। প্রবাদসমূহে ব্যবহৃত হয়েছে সূচকীয় দ্যোতকগুচ্ছ, যেগুলো মানব জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাদ ৮-এ বলা হয়, শুক্লপক্ষীয় আষাঢ়ের নবমীতে যদি মুষলধারে বৃষ্টি হয়, তবে খনা তাঁর শ্বশুরকে বলছেন, কেন আর হিসাব করছেন, আমার কথা মেনে নেন, ওই তিথিতে ওই রূপ বৃষ্টি হলে সেবার এরূপ অনাবৃষ্টি হবে যে, মধ্য সমুদ্রও শুকিয়ে যাবে — সেখানে বক চরে বেড়াবে; যদি খুব প্রবল, বৃষ্টি না হয়ে ওই তারিখে অল্প বৃষ্টি হয় তবে সেবার বর্ষায় এত বৃষ্টি বেশি হবে যে, পর্বতের উপরও মাছ দেখা যাবে; যদি রিমিঝিমি বৃষ্টি হয়, তবে সেবার পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য হবে, আবার প্রবাদ ১০-এর ক্ষেত্রে বলা হয় — যদি অগ্রহায়ণে বৃষ্টি হয়, তবে এরূপ দুর্ভিক্ষ হবে যে রাজাকে ভিক্ষা চাইতে হবে; পৌষে বৃষ্টি হলে দুর্ভিক্ষ আরো ভয়ানক হয়, তখন তুষ বিক্রয় করেও অর্থ লাভ হয়। মাঘ মাসে বৃষ্টি হলে রাজা ও রাজ্য সবাই সুখে থাকে।

ফাগুনে বৃষ্টি হলে অপর্যাপ্ত শস্য হয়। আর চৈত্র মাসে বৃষ্টি হলে তা শষ্যের জন্য মঙ্গলকর হয়। উদাহরণগুলোতে (৪, ৮, ১০) বিভিন্ন মিথিক অনুষঙ্গকে দ্যোতকরূপে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রবাদে রূপকের সাহায্যে গূঢ়ার্থের দ্যোতনা প্রকাশ পেয়েছে। প্রবাদগুলোতে মূলত রূপকের সাহায্যে বাচ্যার্থের সীমায় বিশেষ গূঢ়ার্থকে ধারণ করেছে। তাই ক্রিপো ও এরকাস্কিজ অনুসরণে বলা যায়, আলোচ্য প্রবাদসমূহের পাঠকৃতির ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক দুটো চিহ্নায়ন পদ্ধতিই কাজ করে (cited in Grzybek, 2014:93-4)।

আলোচ্য প্রবন্ধের কিছু প্রবাদের পাঠকৃতিতে ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদকাঠামোর দ্যোতকগুচ্ছ লক্ষ করা যায়। দ্যোতকরূপে বিভিন্ন মিথিক চিহ্ন ও ঐতিহাসিক অনুষঙ্গ ব্যবহার বাগর্থগত দ্যোতনায় প্রবাদের অর্থ আরো সম্প্রসারিত করে। প্রবাদ ৪-এর 'দক্ষিণা' চিহ্নদ্যোতককে বার্তের চিহ্নায়ন মডেলের ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদকাঠামো রূপে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে দেখা যায় বাদল ও বন্যার দক্ষিণ দিকের সাথে একটি শক্তিশালী সম্পর্কের কথার সাথে বামুনের দক্ষিণার বিষয়টি চলে এসেছে, এখানে বাদল ও বন্যার দক্ষিণা আর বামুনের দক্ষিণা দুটো আলাদা বিশেষ গূঢ়ার্থকে নির্দেশ করছে। উক্ত প্রবাদে বাদল ও বানের 'দক্ষিণা' মূলত প্রাথমিক সজ্জার পদকাঠামো অনুসারে চিহ্নিত হয়েছে, কিন্তু বামনের 'দক্ষিণা' বার্তের ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদকাঠামো দ্বারা চিহ্নায়িত হয়েছে। এখানে 'দক্ষিণা' বলতে ঐতিহাসিক পুরাণের গুরু ও শিষ্যের মধ্যকার একটি বিশেষ অর্থবহ আদান প্রদান বোঝায়। একইভাবে ২, ৪, ৫, ৮ ও ৯ সংখ্যক প্রবাদে বরাহ, খনা, দক্ষিণা প্রভৃতি দ্যোতকগুচ্ছ ঐতিহাসিক মিথিক অনুষঙ্গরূপে আমাদের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন যাপন কল্পনা ও মননকে সমৃদ্ধ ও প্রসারিত করতে সাহায্য করে। মূলত মানব ইতিহাস ও সংস্কৃতির যে ক্রমবিবর্তন ঘটেছে, ঐতিহ্য পরম্পরার মধ্যে একটি জাতি সে উপলক্ষ্যগুলোকে নিজেদের মতো গল্প বা কাহিনি আবারো সঞ্চিত করে রেখেছে। এ বিষয়গুলো তাদের মনের গভীরে অবস্থান করে, যাকে Jung and Kerenyci বলেছেন 'Collective unconscious' বা 'সামূহিক নির্জ্ঞান'। এ সামূহিক নির্জ্ঞানের মধ্যে মিথের প্রাচীনতম মূর্তিটি লুকিয়ে থাকে এবং তার চেতন মানসিকতায় সেগুলো ব্যক্ত করা হয় সহজ গল্পের মাধ্যমে (Jung & kerenyci, 2002: 88)। এদিক থেকে আমরা প্রবাদকে চিহ্নায়নের ত্রৈতীয়িক সজ্জার পদকাঠামো মিথের সাথে সংযুক্ত করতে পারি, যা মূলত একটি ভাষা সমাজের বিভিন্ন ভাষাচিহ্নের আরোপিত অর্থবোধের সাহায্যে নির্মিত হয়।

দুই

চিহ্নবিজ্ঞানের আলোকে চিহ্ন হলো ভাষার একটি ক্রিয়াশীল উপাদান যা কেবল শব্দ পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়, যেকোনো ধ্বনি, বাক্য, ছবি, সংকেত, অঙ্গভঙ্গি, চালচলন সবকিছুই চিহ্ন হতে পারে, যদি এ মাধ্যমে কোনো তথ্য প্রক্রিয়াজাত ও

যৌক্তিকতার মাধ্যমে সঞ্চালিত হয়। সাহিত্য সৃষ্টি বিষয়ক যেকোনো আলোচনায় ভাষাচিহ্নের সাথে বিষয়ের সম্পর্ক কী তা ব্যাখ্যা করা হয়। এক্ষেত্রে সস্যুর ভাষাব্যবস্থার উপাদানকে দুভাগে ভাগ করেছেন, মানব মনের নিজস্ব অবচেতনে ভাষার যে সাংগঠনিক সহজাত উপলব্ধি তাকে সস্যুর লগ (langue) হিসেবে অভিহিত করেন এবং ভাষাচিহ্ন প্রয়োগের ফলে মানবমনে জগৎ সম্পর্কীয় যে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায়, তাকে বলেছেন প্যারোল (parole)। সস্যুরের তত্ত্ব অনুযায়ী, ভাষাচিহ্নের বিপরীতে দ্যোতক ও দ্যোত্যিতর অবস্থান নির্ধারণ করা গেলেও কোনো বস্তু বা বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত করা যায় না, ফলে ভাষা একটি সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থায় মধ্যে ভাষাচিহ্ন, দ্যোতক ও দ্যোতিতের সম্পর্ক হিসেবেই উপস্থিত। মূলত ভাষা সবসময়ই একটি নির্দিষ্ট চিহ্নকাঠামো নিয়ে মানুষের জীবন-সম্পর্কীয় ভাব প্রকাশ করে থাকে, তাই চিহ্নবিজ্ঞানের জ্ঞান আমাদের সাহিত্য ও সৃষ্টি সম্পর্কে পূর্ণ উপলব্ধি ও তার অর্থ বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে (মঈন, ১৯৯৭)। এক্ষেত্রে দার্শনিক পার্সের আগ্রহের বিষয় ছিল অর্থ, যা তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন চিহ্ন, মানুষ ও বস্তুর সাংগঠনিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে। পার্সের চিহ্ন ধারণায় চিহ্ন কেবল একটি বিচ্ছিন্ন সত্তা নয়, বরং একটি মধ্যস্থতাকারী একক যা একটি সাধারণ প্রথা বা নীতির মধ্য দিয়ে চিহ্নবস্তু (object) ও চিহ্নবোধের (interpretant) মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে। চিহ্নরূপ (representamen) ও চিহ্নবস্তু (object)-এর সম্পর্কের ভিত্তিতে পার্স ভাষাচিহ্নসমূহকে প্রতিমা, সূচক ও প্রতীক এ তিনটি ভাগে ভাগ করেন (Peirce, 1931-58: 249)। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবাদের চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এগুলোর পাঠকৃতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন চিহ্নের বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে যায়। আলোচ্য প্রবাদসমূহে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সূচক চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এসব প্রবাদের চিহ্নরূপ ও চিহ্নবস্তুর মধ্যে কার্যকারণাত্মক সম্পর্কের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ প্রবাদের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো — বায়ুপ্রবাহের দিক ও সময় এবং আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন শুভ ও অশুভ সম্ভাবনা ও বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির লক্ষণ। মূলত প্রাচীনকাল থেকে আমাদের কৃষিব্যবস্থা প্রকৃতি নির্ভর। নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে অনেক সময় কৃষকেরা কাঙ্ক্ষিত ফসল পায় না, এজন্য অভিজ্ঞতার আলোকে প্রকৃতির গতি-প্রকৃতি অনুমান করে তারা ফসলের চাষাবাদ করে। ধারণা করা হয়, মেয়েদের হাতেই কৃষি কাজের সূচনা। প্রাচীনকালে কৃষিক্ষেত্রে মেয়েদের অনেক প্রভাব ছিল, এ সম্পর্কে আলি নওয়াজ (২০১৪: ৯৮) বলেন, 'কৃষি মেয়েদের দ্বারা শুরু হয়েছিল বলে কৃষি প্রবাদসমূহ মেয়েলী ছড়ার মধ্যে মেয়েদেরই সৃষ্টি'। আলোচ্য প্রবাদগুলো মূলত কৃষিবিষয়ক মানুষের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অন্তঃসার, যা খনার বচনের[১] মাধ্যমে এসেছে। প্রবাদ ২-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, মৃত্যু, মানব চরিত্রের ধরন ও পানি সম্পর্কে কোনো পূর্ব-অনুমান করা যায় না। এখানে বিখ্যাত জ্যোতিষি বরাহর[২] বরাত দিয়ে এখানে তিনটি বিষয়ের অনির্দিষ্টতা সম্পর্কে সাধারণ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে, আবার

এর সাথেই বৈপরীত্যসূচক অন্য প্রবাদগুলোর কথা উল্লেখ করা যায়। বাংলার প্রকৃতিতে বর্ষার শুভাগমনের অনিবার্যতা বোঝাতে প্রবাদ ১৬-তে বলা হয়েছে,

চৈত্রে থরথর, বৈশাখে ঝড় পাথর,
জ্যৈষ্ঠে তারা ফুটে, তবে জানতে বর্ষা বটে।

প্রবাদ ১১-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, চিহ্নবস্তু বৃষ্টির সাথে তিনটি চিহ্নরূপের সমন্বয় করা হয়েছে। এখানে যেবছর চৈত্র মাসে শীত থাকে, বৈশাখ মাসে ঝড় বাদল হয় এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে আকাশে প্রচুর তারা থাকে, সেবছর প্রচুর বৃষ্টি হয়। এখানে বৃষ্টি বিষয়ক একটি চিহ্নবস্তুর ক্ষেত্রে তিনটি চিহ্নরূপের সমন্বয় লক্ষ করা যায়। অনুরূপ প্রবাদ ১১ ও ১২-এর ক্ষেত্রে চিহ্নরূপ ও চিহ্নবস্তুর মধ্যে অনুমানভিত্তিক সম্পর্ক দেখা যায়। এ প্রবাদগুলোতে রাতের আকাশে চাঁদ ও তারা থাকার সাথে বৃষ্টির সম্ভাবনাকে যুক্ত করা হয়েছে। একইভাবে প্রবাদ ১৩ এবং ১৪-তে বর্ষার শুভাগমনের সম্ভাবনা নিয়ে প্রবাদ রচিত হয়েছে। এখানে মূলত সূচক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, প্রবাদ ১১-তে জ্যৈষ্ঠ মাসে যদি আকাশে প্রচুর তারা দেখা যায় তাহলে সে বছর বর্ষায় প্রচুর বৃষ্টিপাতের কথা বলা হয়, একইভাবে ঘন ঘন ব্যাঙ ডাকার সাথে বৃষ্টির একটি কার্যকারণাত্মক সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়। এর সাথে প্রবাদ ৩-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, আষাঢ় মাসে দক্ষিণা বাতাসের সাথে বন্যার একটি কার্যকারণাত্মক সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। অনুরূপ প্রবাদ ৫-এ বছরের প্রথমে ঈশাণ কোণে বাতাস প্রবাহের সাথে বৃষ্টিপাতের একটি যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রবাদ ১-এর ক্ষেত্রে বলা হয়, জ্যৈষ্ঠ মাসে রোদ এবং আষাঢ় মাসে বৃষ্টিপাত হলে শস্য ভালো জন্মে। এর ফলে কৃষকেরা গোলা ভরে শস্য তুলতে পারে। এখানেও চিহ্নবস্তু ও চিহ্নরূপের মধ্যে একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক সম্পর্ক লক্ষ করা যায়। একইভাবে প্রবাদ ৮-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, শুক্লপক্ষীয় আষাঢ়ের নবমীতে যদি অল্প বৃষ্টি হয় তবে সেবছর প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। একইভাবে প্রবাদ ৮ ও ৯ এর পাঠকৃতিতে অনাবৃষ্টির সম্ভাবনা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। এখানে শুক্লপক্ষীয় আষাঢ়ের নবমীতে মুষলধারে বৃষ্টি হলে সে বছর অনাবৃষ্টি হবে এবং পৌষ মাসে ও বৈশাখ মাসে গরম ও প্রথম আষাঢ়ে অল্প বৃষ্টি হলে সে বছরও অনাবৃষ্টির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে, এখানে চিহ্নরূপ ও চিহ্নবস্তুকে অভিজ্ঞতার আলোকে সম্পর্কযুক্ত করা হয়েছে।

প্রবাদ ১, ৩, ৪, ৫, ৭, ৯, ১১, ও ১২, ১৩, ১৪ সংখ্যকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এগুলোর চিহ্নরূপ ও চিহ্নবস্তু কার্যকারণাত্মকভাবে সম্পর্কিত। উদাহরণস্বরূপ, প্রবাদ ১-এ বলা হয় জ্যৈষ্ঠ মাসে রোদ ও আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হলে শস্যের ফলন ভালো হয়। আবার প্রবাদ ১২-এর ক্ষেত্রে বৃষ্টির দুধরনের প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। বৃষ্টি যদি দিনে হয়, তবে শস্যের জন্য তা মঙ্গলজনক নয়, বরং দিনে রোদ ও রাতে বৃষ্টি হলে ধান চাষের জন্য মঙ্গলজনক ফল বহন করে। প্রবাদ ১০-এর

ক্ষেত্রে চৈত্র মাসে বৃষ্টির সাথে ভালো শস্য উৎপাদনের একটি সম্পর্ক অনুমান করা হয়। এখানে প্রবাদগুলোর চিহ্নরূপের সাথে চিহ্নবস্তু একটি কার্যকারণাত্মক সম্পর্কে আবদ্ধ। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি শর্তসাপেক্ষ অনুমান করা হয়। প্রতিটি প্রবাদের পদকাঠামো কখনো প্রতীক বা রূপকের সমন্বয়ে উপস্থাপন করে বিশেষ তাৎপর্য। প্রতিটি প্রবাদেই বাঙালি গ্রামীণ কৃষিজীবী মানুষের বৃষ্টি সম্পর্কিত কিছু উপলব্ধিকে প্রকাশ করা হয়েছে; এখানে প্রবাদ ১ থেকে ১০-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, এরা প্রায় একই ধরনের চিহ্নবোধ (interpretant) প্রকাশ করে। অর্থাৎ একই ধরনের চিহ্নবোধ প্রকাশ করে, যে বিষয়টি সম্পর্কে মানুষের মনের মধ্যে পূর্ববর্তী বা সহগামী প্রত্যক্ষণ রয়েছে। সেটা অভিজ্ঞতা বা অন্য কোনো উৎস থেকে হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, প্রবাদ ৩-এর কথা উল্লেখ করা যায়:

পূর্ব আষাঢ়ে দখিনা বায়
সেই বৎসর বন্যা হয়।

এখানে মানুষ তার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে জানে, যে বছর আষাঢ় মাসে দক্ষিণ দিকে বাতাস বয় সে বছর বন্যা হয়। আবার প্রবাদ ৭-এ দেখা যায়, ভাদ্র মাসের বান এবং চৈত্র মাসের কুয়াশাও মানুষের পক্ষে চরম অমঙ্গলকর হতে পারে, এতে মানুষের মৃত্যুও হয়ে থাকে। চিহ্ন ব্যবহারকারীর মানসিক প্রপঞ্চ প্রবাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ প্রবাহ ও বাস্তব ধারণার সাথে চিহ্ন প্রক্রিয়ায় সংযোগ সৃষ্টি ও সূচকীয় দ্যোতকগুচ্ছের মাধ্যমে ব্যক্তির মনের ওপর প্রভাব প্রযুক্ত হয়ে বোধগম্যতা সৃষ্টি করে।

তিন

মূলত একটি পূর্ণাঙ্গ সাংগঠনিক সংশ্রয়ের মাধ্যমে চিহ্নের অর্থ প্রকাশিত হয়। প্রতিটি প্রবাদের একটি নির্দিষ্ট প্যারাডাইম (paradigm) ও সিনট্যাগম (syntagm) থাকে। প্রবাদের সিনট্যাগম বা প্যারাডাইম কোনো উপাদানের পরিবর্তন করলে তাতে প্রবাদের মূল দ্যোতনা সঞ্চারে বাধার সৃষ্টি হয়। আলোচ্য বৃষ্টি বিষয়ক প্রবাদগুলোর ক্ষেত্রে লক্ষ করলে দেখা যায় — সবগুলো প্রবাদের একটি নির্দিষ্ট প্যারাডাইম ও সিনট্যাগম আছে এবং তা রক্ষিত রয়েছে। সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে প্রবাদের প্যারাডাইম চিহ্ন উপাদানসমূহের কোনো স্থানান্তর বা পরিবর্তন হয়নি, ফলে প্রবাদের সিনট্যাগমেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। অনেক সময়ই প্রবাদের কোনো প্যারাডাইম উপাদান পরিবর্তিত হলে তার সিনট্যাগমও পরিবর্তিত হয়ে যায়, এতে তার প্রবাদ হিসেবে গ্রহণযোগ্যতার সম্ভাবনাও অনেক কমে যায়। আলোচ্য বৃষ্টি-বিষয়ক অধিকাংশ প্রবাদে দেখা যায়, এদের প্যারাডাইম ও সিনট্যাগম অপরিবর্তিতভাবে প্রচলিত রয়েছে।

মানুষের ভাষা ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো ভাবের আদান-প্রদান। এ সংজ্ঞাপনে সত্য বা মিথ্যা যেকোনো ধারণা থাকতে পারে। মূলত ভাষাগত ও অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান আমাদের নির্ধারণ করে দেয় বাক্যটি সত্য না মিথ্যা (Austin, 1962)। প্রবাদ ১, ৩, ৫ ও ৯ সংখ্যক উদাহরণগুলো এক ধরনের সত্যাশ্রয়ী বাক্য। কারণ মানুষ দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ ফলাফলে দেখেছে যে, বর্ষাকালে বৃষ্টি হলে আশানুরূপ শস্য উৎপাদিত হয়। একইভাবে প্রবাদ ৪, ৫, ১১, ১৩ ও ১৪-এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রবাদগুলোর অর্থের দাবি অভিন্ন। এখানে সর্বত্রই বৃষ্টির সম্ভাবনাগুলো বিভিন্নভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এ থেকে পণ্ডিত এরকাস্কিজ অনুসরণে বলা যায়, প্রবাদের পাঠকৃতি একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতির চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ায় চিহ্ন হিসেবে কাজ করে। ১, ৫, ১১, ১৩ ও ১৪ সংখ্যক প্রবাদের ক্ষেত্রেও বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাব্য কারণগুলো সম্পর্কে মানুষের পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা হতে ব্যক্ত হয়েছে। এখানে চিহ্নবস্তু ও চিহ্নবোধের মধ্যে সংযোগ স্থাপনকারী ভূমিকায় রয়েছে চিহ্নরূপ, যার ধ্বনিক উপস্থাপনা হতে পারে বা নাও হতে পারে। মূলত চিহ্নের শুরু হয় চিহ্নরূপের মাধ্যমে। এখানে বিভিন্ন ধরনের চিহ্নরূপের ব্যবহার থাকলেও এগুলোর চিহ্নবোধ ও চিহ্নবস্তুর মধ্যে অভিন্নতা লক্ষ করা যায়।

উপসংহার

আলোচিত প্রবাদগুলোয় বাঙালিদের জীবনযাত্রায় ভৌগোলিক পরিবেশের ব্যাপক প্রভাবের বিষয়টি ফুটে উঠেছে, যা এ অঞ্চলের মানুষ সত্যশর্তযুক্ত ধারণা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা আত্মস্থ করেছে। আমাদের দেশে কৃষিজীবী মানুষের কাছে বিজ্ঞানের অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও বৃষ্টি হলো অন্যতম আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তাই বাংলা প্রবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে এসব বৃষ্টি সংক্রান্ত প্রবাদ। আলোচ্য প্রবন্ধে প্রবাদসমূহের চিহ্নবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রবাদের পাঠকৃতির বক্তব্য বা বিষয় অত্যন্ত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে উপস্থাপিত। মূলত ব্যবহারিক মূল্যের গুরুত্বের কারণে অধিকাংশ প্রবাদ বাচ্যার্থে নির্মিত। এ ছাড়া বৃষ্টি-সংক্রান্ত প্রবাদসমূহের পাঠকৃতিতে সূচক চিহ্নের প্রচুর ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ এসব প্রবাদে চিহ্নরূপ ও চিহ্নবস্তুর মধ্যে অনুমান সাপেক্ষে একটি কার্যকারণাত্মক সম্পর্ক রয়েছে। কিছু কিছু প্রবাদে রূপকের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন, প্রবাদ ২-এ বামনের সাথে বন্যা ও বৃষ্টির তুলনার বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। আবার প্রবাদ ১০-এ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা বোঝাতে রাজার ভিক্ষে করা কিংবা প্রবাদ ৮-এ অনাবৃষ্টি বোঝাতে মধ্য সমুদ্র শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে তুলনা করার বিষয়টি উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতি থেকে বিচিত্র অভিজ্ঞতার ফলে এ ধরনের প্রবাদের সৃষ্টি হয়েছে। প্রবাদের ওপর সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে এবং এ প্রবাদগুলো পল্লিবাংলার জীবন-সংস্কৃতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। এসব প্রবাদ মানুষের সৃষ্টিশীল মনোবিকাশে যেমন সহায়তা করে, তেমনি সহজ

প্রকাশভঙ্গির মাধ্যমে রসাবেদনমূলক শব্দালংকারের দ্যোতনায় মানুষের মনে আনন্দানুভূতি সঞ্চার করে থাকে। প্রবাদ একক মনের অনুভূতির ফলে সৃষ্টি হলেও তা সমগ্র সমাজের সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ায়, তাই আমাদের সমাজ-সংস্কৃতিতে এসব প্রবাদের আবেদন চিরন্তন বলা যায়। সময়ের সাথে সাথে প্রবাদের ব্যবহারেও পালাবদল হয়, এ পালাবদলকে শনাক্ত ও ব্যাখ্যা করার জন্য ধারাবাহিক গবেষণা প্রয়োজন।

টীকা

১. 'খনা'র অস্তিত্ব নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। গবেষক সৈয়দ আলী আহসানের (১৩৯২) মতে, খনা একজনের নাম বা ছদ্মনাম যিনি জ্ঞানী এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রে পরাঙ্গম ছিলেন। খনার আবির্ভাব কাল অষ্টম শতক এবং বাঙালি কৃষিজীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রচনার জন্য তাকে বাঙালি বলা যায়। খনার বিভিন্ন বচনে জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে গণনার ভিত্তিতে বলা হয়েছে খরা, বৃষ্টি, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, শস্যহানি — এগুলো কেন ঘটে থাকে। অর্থাৎ এসবের ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। বরাহ মিহির যেভাবে তাঁর জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনার সাহায্যে কল্যাণ বা অকল্যাণ নির্ধারণ করেছেন, খনার বচনেও তা লক্ষ করা যায়।

২. বরাহ ছিলেন প্রাচীন ভারতে বিখ্যাত জ্যোতিষী, তিনি ছিলেন উজ্জয়িনীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিত। তিনি জ্যোতিষশাস্ত্রের গণনার সাহায্যে শুভাশুভ ও কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ধারণ করেছিলেন। এছাড়া বলা হয় তিনি ছিলেন মিহিরের পিতা ও খনার শ্বশুর। খনা বরাহ মিহিরের অনেক দুঃসাধ্য সমস্যার সমাধান করে দেন। একারণে রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁকে রাজসভার দশম পণ্ডিত হিসেবে আসন দেন। বিষয়টি বরাহ মেনে নিতে পারেননি। তিনি পুত্র মিহিরের মাধ্যমে খনার জিহ্বা কেটে ফেললে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে খনার জীবনাবসান হয় (আজহার, ২০১৭)।

সহায়কপঞ্জি

আজহার ইসলাম, ২০১৭। *ডাক ও খনার বচন*, শামস আল্‌দীন ও আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত, শোভা প্রকাশ, ঢাকা।

আলি নওয়াজ, ২০১৪। 'ঔপনিবেশিক আমলে খনার বচন', *খনার বচন : কৃষ্টি ও সৃষ্টি*, আফসার ব্রাদার্স, ঢাকা।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, ১৯৬২। বাংলার *লোক-সাহিত্য (১ম খণ্ড)*, ক্যালকাটা বুক হাউস, কলকাতা।

কাজী দীন মুহম্মদ, ১৯৬৮। *লোক-সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা।

মঈন চৌধুরী, ১৯৯৭। *সৃষ্টির সিড়ি*, পাঠক সমাবেশ, ঢাকা।

মুহম্মদ আবদুল হাই, ১৩৬৫। 'বৃষ্টির প্রবাদ', *ফজলুল হক মুসলিম হল বার্ষিকী*, ফজলুল হক মুসলিম হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান, ২০১১। 'বাংলা প্রবাদ : দ্যোতিতের ভাষা-দর্শন', *সাহিত্য পত্রিকা*, বর্ষ ৪৮, সংখ্যা: ৩, আষাঢ় ১৪১৮, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

সৈয়দ আলী আহসান, ১৩৯২। 'ডাক ও খনার বচন', *সাহিত্য পত্রিকা*, ঊনত্রিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, কার্তিক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Austin, J. L., 1962. *How to do things with words.* Harvard University Press, Cambridge.

Barthes, R., 1972. *Mythologies*, trans. Annette Lavers, Jonathan cape, London.

Crépeau, P., 1975. *La définition du proverbe*. Fabula 16, 285–304.

Fiske, J., 1990. *Introduction to communication studies*, Routledge, London.

Greimas, A. J., 1970. Les proverbes et les dictons. In A. J. Greimas (Ed.), *Du sens. Essais sémiotiques* (pp 309-314). Editions du Seuil, Paris.

Grzybek, P., 2014. Semiotic and semantic aspects of the proverb. In Hriszтov Gotthardt, H. & Varga, M. A. (Eds.), *Introduction to paremiology: A comprehensive guide to proverb studies*: 68–107. DeGruyter, Berlin.

Jung C.G. and Kerenyi C., 2002. *Essays on a science of Mythology*, Routledge, London.

Peirce, C.S., 1931-58. *The Collected Papers (8 vols.)* eds. Charles Hartshorne et al,. Harvard University press, Cambridge, MA .vol. 2.

Bogatyrëv, P., 1971. *The functions of folk costume in Moravian Slovakia.* trans. R.G.Crum. The Hague, Mouton (First edition.1937).